স্বপ্ন!

যেন জন্ম-জন্মান্তর পার হয়ে গেছে তারপর।

সাতাশ বছর আগের আবুধাবী। আজকের মত দ্বীপান্বিতা সৌধশ্রেণী সংকলিতা নয়, ধু ধু মরুভুমির মধ্যে হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী ছোট ছোট কুঁড়েঘরে ঢাকা ছোট্ট শহরে কয়েকটা মাত্র দালান। দুই কামরার এমনি এক কুঁড়ে ঘর ভাঙাবাড়ী নামে বিখ্যাত, বাঙ্গালীদের ব্যাচেলর মেস। তার একটা কামরায় খাটে দু'জন আর মেঝেতে একজন, এই ভাবে থাকে বাড়ির ভাড়াটে তিন কিশোর। বাকী ঘরটা রাখা আছে রাজ্যের অনাথ-অতিত, অধম-পতিতদের জন্য যাদের চাকরী নেই, ভিসা নেই, কারো আবার পাশপোর্টই নেই। সে বাসায় একদিন সান্ধ্য আড্ডা বসেছে। আড্ডা জিনিসটা সব দিন জমাট হয় না, কিন্তু সেদিন আড্ডা জমেছে তুমুল। মরুভুমির ভাঙ্গাবাড়ি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে বাঙ্গালী কিশোরদের প্রাণবন্ত কন্ঠে....কামাল, বিনয়, শান্তি, আলো, মমতাজ, কাজী, রিজওয়ান..... ঘরের চুন ওঠা দেয়ালে বয়সহীন এয়ার কন্ডিশনার কাজ করে চলেছে প্রভুভক্ত ভৃত্যের মতন আশ্চর্য্য নিঃশব্দে, বাইরে গরম কিন্তু কুল কুল ঠান্ডায় চমৎকার ঘরের ভেতরটা।

ধড়াম করে দরজা খুলে ঢুকল কেউ, ধড়াম করে দরজা বন্ধ করল। রুদ্ধশ্বাসে দু'চোখ তার বিস্ফারিত। মহা আনন্দে নয়, ঘোর আতংকে। একটু আগে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে সে। সন্ধ্যার আধা-অন্ধকারে রাস্তা পার হতে গিয়ে কানের কাছ দিয়ে সাঁই করে বেরিয়ে গেছে মাইক্রোবাস, একটু এদিক ওদিক হলেই মাথা ফেটে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ত রক্তাক্ত মগজ।

তারপর আড্ডায় এই রকম কথা হল।

''জাপানী স্কুলের মাইক্রোবাস, নাম লেখা আছে গায়ে। স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে যাচ্ছিল বাসায় বাসায় পৌঁছে দেবার জন্য''।
''জাপানি ছাড়াও বৃটিশ অ্যামেরিকান সবাই নিজেদের স্কুল বানিয়েছে এখানে। স্কুলগুলোর নিজস্ব মাইক্রোবাসে ওরা বাচ্চাদের আনা-নেওয়া করে''।
''কিন্তু আমাদের বাংলাদেশীদের স্কুল নেই''।
''আমাদের বাংলাদেশীদের স্কুল নেই কেন?''
''আমাদেরও স্কুল চাই''।
''হ্যাঁ হ্যাঁ, - আমাদেরও স্কুল চাই ..... ''।

সারা রাত ধরে মরুতামসের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকল নামহীন কিছু কিশোরের স্বপ্ন- ''আমাদেরও স্কুল চাই..... আমাদেরও স্কুল চাই..... আমাদেরও স্কুল চাই....''। তারপর অলক্ষ্যে কোথাও কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিল আকাশের গ্রহ-তারা।

পরদিন সেই উচ্চশিক্ষাহীন উচ্চ-চাকরিহীন ছেলেগুলো তাদের স্বপ্ন গিয়ে হাজির জালাল ভাইয়ের বাসায়। সিলেটের সুদর্শন যুবক, পাওয়ার হাউসের ইঞ্জিনিয়ার। কি? না - আমাদেরও স্কুল চাই। মন দিয়ে তিনি শুনলেন কথাগুলো, যেন দিব্যচোখে দেখলেন এবং স্পর্শ করলেন স্বপ্নটা। তার পর দিন সদলবলে সবাই গিয়ে পড়লেন গোলাম রহমানের অফিসে, স্কুল প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দেবার জন্য।

কিছু লোক থাকে যাদের বয়স অনুমান করা দুঃসাধ্য। ছিপছিপে এ বুড়ো এ বয়েসেও দেবানন্দের মত রূপবান সরস, যেন আঙ্গুর থেকে কিসমিস হয়েছেন। সিলেটের লোক, পুর্ব পাকিস্তান সরকারের চীফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। রিটায়ার করতেই বাঙালী ধনকুবের জহুরুল ইসলাম তাঁকে হাইজ্যাক এনে বসিয়ে দিয়েছে তার আবুধাবীর বিখ্যাত কনষ্ট্রাকশন কোম্পানি বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের কর্ণধার হিসেবে।

কিন্তু বলতে গেলে তিনি দুর দুর করেই তাড়িয়ে দিলেন সবাইকে। বড় কাজ করতে চাও, শুরুতেই ভজঘট? যাও, ফিরে যাও আজ। তারপর টেলিফোনে আমার সেক্রেটারিকে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বানাও, সেই মোতাবেক এসে দেখা কর। বিল্ডিং-এর বাইরে এসে কে যেন ভুরু কুঁচকে সন্দেহে বলল - ''বুড়া হালায় আমাগো অপমান করল নাকি রে?'' কে যেন দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে জবাব দিল, ''বুঝতাছি না দোস্ত। হালায় অরিজিন্যালি আছিল বৃটিশের সি-এস-পি, সিষ্টেম ছাড়া কিছুই বুঝে না''।

দু'দিন পরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট মাফিক যখন তাঁর অফিসে সবাই, তখন রাজকীয় নাস্তায় ভরপুর টেবিল আর তার সুগন্ধে ম' ম' অফিস ঘর। সেই থেকে প্রায় দু'বছর যেভাবে নেতৃত্ব দিলেন তিনি, তাতে সাংগঠনিক ট্রেনিং আর বাস্তব অভিজ্ঞতায় ভরে উঠল আমাদের ঝুলি। সেজন্য তাঁর কাছে আজও আমি কৃতজ্ঞ। সেদিন তিনি প্রথম কাজ দিলেন, কত ছাত্র আমরা জোগাড় করতে পারব, শিক্ষক কোথায় পাব, স্কুল কোথায় হতে পারে এসব রিপোর্ট দিতে। সারা সপ্তাহ প্রচুর ঘোরাঘুরি করে পরের মিটিং-এ গদ গদ খুশীতে রিপোর্ট দিলাম, আটাশ জন ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া গেছে। যেন হাতে চাঁদ পাওয়া গেছে! আর ভাবীরা সবাই বড় বড় পরীক্ষা পাশ করে এসে কেবল ঘন্টা ধরে ফোনে আড্ডা দেন আর দাওয়াত খান, তাঁরা খুশী মনে রাজী হয়েছেন বিনে পয়সায় মাষ্টারী করতে।

অপ্রত্যাশিত ভেটো দিয়ে বসলেন নেতা। বিনামূল্যের মাষ্টার দিয়ে শিক্ষা হয় না। ওসব ফাঁকিবাজী চলবে না, মাষ্টারদের বেতন দিতে হবে। মাথায় বাড়ি পড়ল আমাদের। বলে কি লোকটা! আটাশ জন ছাত্র দিয়ে বেতন কিভাবে দেব? এমন বোকামীর কোন মানে হয়, বিশেষ করে ভাবীরা নিজেরাই যখন পয়সা ছাড়া রাজী! মাথা চুলকে বেরিয়ে এলাম সবাই, ভাবীদের বললাম উপায় নেই, নামমাত্র হলেও কিছু বেতন নিতেই হবে। ভাবীরা অগত্যা রাজী হলেন, মাসে পাঁচশ' দিরহাম করে নেবেন তাঁরা প্রত্যেকে। পরের সপ্তাহের মিটিং-এ আবার ভেটো দিয়ে বসল বুড়ো, অন্যান্য স্কুলে সর্বনিম্ন কি বেতন দেয় সে খবর নিয়ে এস। হুবহু সেই বেতনই দিতে হবে, কারণ আন্তর্জাতিক সমাজে বাঙ্গালী স্কুলকে কেউ যেন মিসকিন না বলতে পারে।

উপস্থিত সস্তার লোভে এই জরুরী কথা ভোলেন নি আমাদের দূরদর্শী নেতা। কিন্তু অন্যান্য স্কুলে খবর নিয়ে আবার আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হল। ইউরোপ-অ্যামেরিকা-জাপানের কথা থাক, পাকিস্তানী স্কুলের মাষ্টারদের বেতনটাই বারো-তেরোশ' দিরহাম মাসে। অত পয়সা আমরা কোথায় পাব? পরের মিটিং-এ রিপোর্ট দিয়ে মুখ হাঁড়ী করে বসে রইলাম আমরা, কিন্তু উৎফুল্ল হয়ে উঠল বুড়ো। সিদ্ধান্ত লেখা হল, আমাদের মাষ্টাররা মাসে ওই বেতনই পাবেন। কে যেন খুশী হয়ে বলল, তার মানে আপনার কোম্পানী এ টাকাটা দেবে? শুনে হাই পাওয়ারের চশমার ভেতর থেকে জ্বলজ্বলে আলুচেরা চোখে তাকালেন তিনি। বললেন, দয়ার দান নেবে না বাংলাদেশ স্কুল। আর, উপহার নিতেও যোগ্যতা চাই, ওটা এখনো নেই আমাদের।

তাহলে? জালাল ভাই সহ আমাদের চোখে তখন হাজার সর্ষেফুল। টাকাটা আসবে কোত্থেকে? নেতা-ই সমাধান দিলেন। আপাততঃ অর্ধেক বেতন ক্যাশ নেবেন মাষ্টাররা, বাকী অর্ধেক খাতায় লেখা থাকবে দেনা হিসেবে। যদি কোনদিন স্কুল নিজের পায়ে দাঁড়ায়, তবে সে দেনা শোধ করতে হবে অবশ্যই সর্বপ্রথম, অন্য কিছু করার আগে।

এটা আদপেই কোন সমাধান কিনা তা ও বয়েসের মাথায় ঢুকল না, কিন্তু গিঁট্টিটা তো খুলল। চিঠি লিখে দিলেন তিনি, মদিনা জায়েদের আরবী স্কুলের হেডমাষ্টারের কাছে। সকাল আটটা থেকে বেলা দু'টো পর্য্যন্ত তোমাদের আরবী স্কুল, - তার পরে পুরো দালানটা খালি পড়ে থাকে। আমাদের অনুমতি দাও, আমরা বাংলাদেশ স্কুল খুলব চারটে থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত। তখনো আবুধাবীতে স্কুল-বোর্ডের আমলাতন্ত্র গড়ে ওঠে নি, হেডমাষ্টারই স্কুলের সর্বেসর্বা। এ হেন অনুরোধ হেডমাষ্টারের জীবনে এই প্রথম, আনন্দে হৈ হৈ করে উঠল লোকটা। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এ আর বলতে! তালিমই মানুষকে মানুষ বানায়, না হলে মানুষ গাধা থেকে যায়। যাও, বিকেল থেকে স্কুল তোমাদের সম্পত্তি, পানি বিজলী সব ফ্রী করাই আছে সরকার থেকে। দারোয়ানকে বলে দিচ্ছি, ও সব দেখাশোনা করবে, সম্ভব হলে ওকে দু'চার দিরহাম ''বাখ্‌শিস্‌'' দিও। দারোয়ানটা ইয়েমেনী, বাসা তার স্কুলের পাশেই।

সেই একটা আশ্চর্য্য দিন এসেছিল মরুভুমিতে, সেই এক মাহেন্দ্রক্ষণে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ স্কুল। সুস্মিত বিস্ময়ে সেদিনের সুর্য্য দেখেছিল, স্কুলের আঙ্গিনায় বালুর মধ্যে আনন্দে ছুটোছুটি করছে আমাদের আটাশটা বাঙ্গালি বাচ্চা। বাংলায় হাসছে বলছে, খুনসুটি করছে, দৌড়দৌড়ি করে খেলছে, আর স্কুলের ক্লাসে বাংলায় পড়া শেখাচ্ছেন বাঙ্গালী শিক্ষয়িত্রী। এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে উপভোগ করছেন কিছু উৎসাহিত অভিভাবক। সবচেয়ে উল্লসিত সেই ইয়েমেনী দারোয়ান, মহা উৎসাহে ঘুরে ঘুরে বাচ্চাদের দেখাশোনা করছে, ওদের ফেলা ময়লা হাসিমুখে পরিস্কার করছে। আজ মনে হয় লক্ষ দিরহামেও শোধ হত না ওই বিদেশী লোকটার ওই অযাচিত স্নেহ, ওই সহাস্য পরিশ্রম - ক'টা দিরহামই বা ওকে আমরা দিতে পেরেছি!

ফয়জুল্লা ভাবী (পতির নামে সতির নাম) হলেন হেড মিষ্ট্রেস, আবুধাবীতে চালু হয়ে গেল বাংলাদেশ ইসলামিয়া স্কুল। সাথে রইলেন অন্যান্য ভাবীরা, যেন উৎসবের বন্যা বয়ে গেল সারা শহরে। এতদিন যাঁরা পড়শোনার অসুবিধের জন্য বৌ-বাচ্চাদের দেশ থেকে আনতেন না, এবার তাঁরা ইমিগ্রেশন অফিসে ছুটলেন পরিবারের ভিসার জন্য। চুম্বকের মত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গোলাম রহমানের বশবিদ্যা জানা ছিল, বশ হলেন জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার আর রাষ্ট্রদূত। অনতিবিলম্বে শুরু হয়ে গেল চাঁদাবাজী। জনতা ব্যাংকে আর এমব্যাসীতে পা' ঠেকালেই দিতে হচ্ছে পাঁচ দিরহাম করে স্কুল-চাঁদা। ব্যাপারটা বেআইনী, কিন্তু গরজ বড়ই বালাই। অনতিবিলম্বে শোধ হয়ে গেল ভাবীদের বকেয়া বেতন।

সেই শুরু। এরপরে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী বাড়ল, স্কুল-কমিটি বানানো হল, সম্ভবতঃ জালাল ভাই প্রেসিডেন্ট হলেন আর আমরা মাঠকর্মী। পরে কি এক কারণে মদিনা জায়েদ থেকে রোদা ক্লিনিকের পাশের আরবীস্কুলে চলে গেল আমাদের স্কুল। সেখানে শুধু বাচ্চাদের নিয়ে করা হল বিচিত্রানুষ্ঠান, সাথে রইলেন এমব্যাসীর কমার্শিয়াল অ্যাটাচী হেলাল ভাই আর ভাবী। লেবার অ্যাটাচী সুগায়ক বোরহান ভাই আর তাঁর সুগায়িকা স্ত্রী স্কুলের একটা মর্মসংগীতই তৈরী করলেন। সাথে রইল আমাদের লালা-দা' (সরিৎ কুমার লালা) ও তাঁর স্ত্রী অনন্যা গায়িকা বুলবুল মহলানবীশ - যার একক কনসার্ট হত মিলনায়তনে, যার পরিশীলিত সুকণ্ঠের রাগভিত্তিক গান সারা রাত ধরে শোনার মত। এদিকে প্রেসিডেন্ট শেখ জায়েদ জানালেন আমরা যত টাকা তুলব তিনি তত টাকা দেবেন। কালক্রমে অনেক টানাহ্যাঁচড়ার পর শেখের

এক বাঙ্গালী বন্ধুর মাধ্যমে সরকার থেকে স্কুল তার নিজস্ব জমি পেল মরুর নামের এলাকায়, বিল্ডিং তৈরীর নক্শা কম পয়সায় করে দিল শামসুল আলম ভাইয়ের আর্কিটেকচার কোম্পানি, তালপাতার সেপাই শরীর নিয়ে সিন্হা দা' দিনরাত খাটলেন এ নিয়ে। তারপরে একের পর এক স্কুলের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন কারা যেন, তারপরে টেলিফোনের পদস্থ অফিসার ফজলুর রহমান। আর তার পরে একই সাথে স্কুলের প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট আর বাংলা নাট্যগোষ্ঠির নেতা হলেন সকলের প্রিয় ডঃ জাফর সাদিক, অনন্য এক বাঙ্গালী দশভুজ।

দিনে দিনে ফুলের মত ফুটে উঠল স্কুল, বর্ষার পুকুরে প্রাণবন্ত কলমী শাকের মত বেড়ে উঠল দেখতে দেখতে। এতটাই বেড়ে উঠল যে পেশাগত শিক্ষাবিদের দরকার হল। বাংলাদেশ থেকে ভিসা দিয়ে আনানো হল ঢাকার ল্যাবরেটরি স্কুলের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ (প্রতিষ্ঠাতা?) মিঃ শামিমকে। তাঁর অভিজ্ঞ হাতে একেবারে যেন আকাশ ছুঁয়ে ফেলল বাংলাদেশ ইসলামিয়া স্কুল। দুঃখের কথা, প্রায় দু'বছর পর হজ্ব করতে গিয়ে তিনি পোষাক পাশপোর্ট পেছনে রেখে লুঙ্গী-চপ্পল পরে এমনই হারিয়ে গেলেন যে আর কোনদিনই তাঁর খোঁজ পাওয়া যায় নি। অনেক হাত বদলের পর কমিটির জি-এস হিসেবে শক্ত হাতে হাল ধরলেন নাসরুল ওয়াহিদ ভাই, এক অসাধারণ নেতা। কয়েক বছরের প্রচন্ড পরিশ্রম আর তীক্ষ্ম নেতৃত্বে স্কুলকে একেবারে তুঙ্গে পৌঁছিয়ে তিনি বিদায় নিলেন ক্যানাডার নাগরিকত্ব নিয়ে।

আজ কয়েক একর জমির ওপরে সে স্কুলের সুবিশাল দালান। যে স্কুলের মাষ্টারের অর্ধেক বেতন ছয়শো দিরহাম খাতায় বাকী লিখতে হয়েছে, আজ সে স্কুলের অ্যাকাউন্টে ফিক্সড্ ডেপজিট আছে আ-ট ল-ক্ষ দিরহাম। আগে যে বাংলাদেশীরা পাকিস্তানী বা ভারতীয় অ্যাসোসিয়েশনের মিলনায়তনে বিচিত্রানুষ্ঠান করতে বাধ্য হত, এখন তারা নিজেদের স্কুলে শক্তিশালী শব্দ-যন্ত্রের সুবিশাল মিলনায়তনে একুশে ছাব্বিশে আর ষোলই উদ্‌যাপন করে। আটাশ দিয়ে শুরু হয়েছিল যার, আজ সে স্কুলে প্রায় চার শ' ছাত্র-ছাত্রী! কি অবিশ্বাস্য, ছোট্ট কিছু ক্লাস নিয়ে জন্ম হয়েছিল যার, আজ সে স্কুলে ঢাকা বোর্ডের এস-এস-সি পরীক্ষা হয়, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাও হয়!! ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে ঢাকা বোর্ডের প্রশ্নপত্র আসে, ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে পরীক্ষার খাতা ঢাকা বোর্ডে ফেরৎ যায়। এমব্যাসীর অফিসারেরা পরীক্ষা হলে টহল দেন। এত সাফল্য, এত সুখ আমরা রাখব কোথায়!

আর? আজ বাচ্চাদের আনা-নেওয়া করে স্কুলের নিজস্ব বড় দু'টো বাসের সাথে ভাড়া করা আরও পাঁচটা মাইক্রো বাস।

মাইক্রোবাস! মাইক্রোবাস!!

যা থেকে দীর্ঘ সাতাশ বছর আগে এই স্কুলের স্বপ্ন দেখেছিল কিছু নাম না জানা পরিচয়হীন বিত্তহীন কিশোর, ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অসাধ্যসাধনে!!

কিছু ব্যর্থতাও আছে, আছে কিছু বেদনা। কিন্তু সে কথা থাক। সাফল্য আর সুখের প্লাবনে আজ ঢাকা পড়ে যাক সবকিছু। সেই স্বাপ্নিক কিশোরের দল এখন জীবনের ধাক্কায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে চারিদিকে, কারো চোখে আজ নুতন কোন স্বপ্ন ঝিকমিক করে কি না জানি না। আবুধাবীর এক দ্বীপে চাকরীর নামে নির্বাসনে আছে বিনয়, - কামাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফ্লোরিডায়। রিজওয়ান আর মমতাজ থাকে ক্যানাডায়, - আলো এখন দুবাইয়ের এক কোম্পানীর কর্নধার, শান্তি নামের সবচেয়ে নরম ছেলেটা দেশে ফিরে জাহাজ কাটার ব্যবসা করছে। ফয়জুল্লাহ ভাই, শামসুল আলম ভাই, ফজলুর রহমান ভাই কোথায় আছেন জানি না।

হেলাল ভাই ঢাকায় ব্যবসা করেন, বুলবুল মহলানবীশ দেশে ফিরে সংস্কৃতির জগতে ব্যস্ত, বোরহান ভাই বাংলাদেশে পুলিশের সর্বাধিনায়ক ইন্স্পেক্টর জেনারেল হয়েছিলেন, টেলিভিশনে এখনও গান করে থাকেন স্বামী-স্ত্রী। জাফর ভাই এখনো আবুধাবীতে, দুই যুগ পরে এসে সম্প্রতি নিজের গড়া স্কুলের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন জালাল ভাই। বৃত্তাকার জীবন!

আর গোলাম রহমান? আমাদের সেই কট্টর অথচ স্নেহময় এবং দুরদর্শী অভিজ্ঞ নেতা? এক জালাল ভাই ছাড়া আমাদের মত একপাল ছন্নছাড়া অনভিজ্ঞদের নিয়ে এক অনন্য প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়ে গেছেন যিনি অবিশ্বাস্য নেতৃত্বে, তাঁর দান কি করে ভুলবে আবুধাবীর বাংলাদেশীরা! তিনি নশ্বর দেহ রেখেছেন ক'বছর আগে। আজ তিনি নেই, স্কুলে তাঁর একটা ছবিও নেই। কেউ খেয়াল করেনি কথাটা দীর্ঘ সাতাশ বছরে।

পৃথিবীতে শতকরা নিরানব্বই জন মানুষের শতকরা নিরানব্বইটা স্বপ্ন কখনো সফল হয় না। তবু স্বপ্ন থাকতে হয়, স্বপ্নই জীবনের প্রধান চালিকাশক্তি। সবার জীবনে কিছু অন্ধকার থাকে যাতে মনে হয় কোথাও কোন আলো নেই, আবার কিছু আলোও থাকে যাতে মনে হয় কোথাও কোন অন্ধকার নেই। মরুভুমির ওপরে গর্বিত দাঁড়ানো ওই বিশাল স্কুল, সারি সারি ওই ক্লাশরুম, ওই ল্যাব - ওই মিলনায়তন - ওই বাংলা-বিদ্যাপিঠ আমাদের সেই আলো, - সেই দিকবর্তিকা। না-ই বা থাকল কোন ফটোগ্রাফ সেই স্বাপ্নিক কিশোরদের, না-ই বা থাকল কোন দলিল। না-ই বা মনে রাখল কেউ। কিচ্ছু আসে যায় না তাতে। যেমন কিচ্ছু আসে যায় না যদি এ নিবন্ধে নাম-তারিখের কোন ছোটখাট ভুল থাকে, কোন নাম বাদ পড়ে থাকে। এই হল সেই স্বপ্ন যেখানে কেউ আওয়ামী লীগ বি-এন-পি নয়, জামাতি বা জামাত-বিরোধী নয়। জননী জন্মভুমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী - এখানে সবাই মাতৃভুমির সন্তান, মাতৃভাষার সন্তান। সবাই যে যা পারে করেছে, যে যা পারে দিয়েছে। নিজের দু'কড়ি দিয়ে সবাই মাতৃভুমির আর মাতৃভাষার ঋণ শোধ করার চেষ্টা করেছে। তাই তো বিদেশের বালুতে গড়ে উঠতে পেরেছে জাতির মর্মর বিদ্যাকেন্দ্র! আবুধাবীতে যদি হতে পারে, হতে পারে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যদি চোখে স্বপ্ন থাকে। স্কুল যদি হতে পারে, হতে পারে যে কোন বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান যদি চোখে স্বপ্ন থাকে।

বুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলে অনেক স্বপ্নকেই বাস্তব মনে হয়, অনেক বাস্তবকেই স্বপ্ন মনে হয়। আবুধাবীর ওই বিশাল বাংলাদেশ স্কুলকে যেন স্বপ্ন মনে হয় আজ এই সাতাশ বছর পরেও। ওখানে ছিলাম আমি..... মরুভুমির সেই মায়াময় ভাঙ্গাবাড়ি .....সেই সন্ধ্যার আড্ডা..... জাপানি স্কুলের সেই মাইক্রোবাস..... আর সেই দু'চোখ ভরা স্বপ্ন.....

আবুধাবীর অভ্রভেদী গর্বিত বাংলাদেশ স্কুল!

ফতেমোল্লা
২৩শে নভেম্বর ৩৪ মুক্তিসন (২০০৪ সাল)।